দাস বংশ

৭। ইলতুৎমিসের কৃতিত্ব আলোচনা কর, তাঁকে দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা যায় কী?

অথবা

দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের সংরক্ষণে ইলতুৎমিসের অবদান উল্লেখ করো। তাঁকে দাস বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান বলা হয় কেন?

উঃ দিল্লি সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রথম যুগের নরপতিদের মধ্যে ইলতুৎমিস সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন, 1210 খ্রী: দিল্লীর প্রথম সুলতান কুতুবউদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যু হলে দিল্লীর নব সুলতানি সাম্রাজ্য এক গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয়। তখন সভাসদ কুতুবউদ্দিনের পুত্র আরাম শাহ কে দিল্লির সিংহাসনে বসানো হয়, কিন্তু তার শাসন কালে ভারতে মুসলমান আধিপত্য এবং সমগ্র সঙ্কট জনক অবস্থা দেখা দেয় কুতুবউদ্দিনের রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহের ফলে কুতুবউদ্দিনের সামসউদ্দিন ইলতুৎমিসের সাহস ও প্রাক্রম দেখা দেয়। কিন্তু সুলতান সামসউদ্দিন ইলতুৎমিসের (1210-1236) খ্রী: সাহস, বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার ফলে সেই সঙ্কট দূর হয় এবং সুলতানি রাজ্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়,

■ **ইলতুৎমিসের সমস্যা :-** সিংহাসনে আরোহণ করেই ইলতুৎমিসকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলি হল –

ক) নাসিরউদ্দিন কুবাচা মুলতানে তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং পাঞ্জাবের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার করতে চেষ্টা করেন,

খ) গজনীর অধিপতি তাজউদ্দিন ইলদুজ নিজেকে ভারতে মহম্মদ ঘুরির বিজিত অঞ্চলের ন্যায্য দাবিদার হিসেবে প্রস্তুত ছিলেন না, ভারতে তুর্কিদের দ্বারা অধিকৃত অঞ্চলের দাবি তুলতে প্রস্তুত ছিলেন না,

গ) কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আলিমর্দান খলজি বাংলাদেশে [redacted] তাঁর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন [redacted]

ঘ) রণথম্ভোর ও গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজারাও সুযোগ বুঝে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। [redacted] সুতরাং সমস্ত দিক থেকে ইলতুৎমিস এক জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন এবং ভারতে মুসলমান আধিপত্যের সংহতি বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম হয়।

■ **সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ :-** অসমসাহসী ইলতুৎমিস অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান করেন, যেমন –

ক) 1216 খ্রী: তরাইনের কাছে এক যুদ্ধে ইলতুৎমিস তাজউদ্দিন ইলদুজকে সম্পূর্ণ ভাবে পরাজিত ও বন্দী করেন, 1217 খ্রী: তিনি নাসিরউদ্দিন কুবাচাকে পরাজিত করে পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত করেন,

খ) 1225 খ্রী: তিনি বাংলার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং 1231 খ্রী: পর পর কয়েকটি অভিযান পরিচালনা করে বাংলাকে সম্পূর্ণ ভাবে দিল্লীর অধিকার ভুক্ত করে নেন,

Scanned with CamScanner

ঘ) 1228 খ্রী: তিনি সিন্ধুদেশ ও দখল করেন, এরপর বুন্দেলখণ্ডের গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর প্রভৃতি অঞ্চল ইলতুৎমিস দখল করেন, মুলতান, উচ্ ও লাহোর এক বিস্তৃত অঞ্চলে ইলতুৎমিসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঙ) তাঁর রাজত্ব কালে 1221 খ্রী: বিখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ তাঁর রাজ্য সুলতান জালালুদ্দিনকে তাড়া করে সিন্ধু উপকূলে পৌঁছান, জালালুদ্দিন ইলতুৎমিসের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন, অনুরোধে সাড়া দিলে ইলতুৎমিস অত্যন্ত বিচক্ষণ ভাবে এড়িয়ে জালালুদ্দিনকে ফিরিয়ে দেন। দূরদর্শী সুলতান মোঙ্গলদের বিরূপ করেন নি, কিন্তু জালালের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে সিন্ধু দেশে প্রবেশ করলে চেঙ্গিস খাঁর বিধ্বংস করা আক্রমণ থেকে ভারত রক্ষা পায়, এই ঘটনায় ইলতুৎমিসের বিচক্ষণ রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন তাই নয়, দিল্লিতে জালালুদ্দিনের আশ্রয় দিলে দিল্লির ভূমি মোঙ্গল-আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিত। দূরদর্শী ইলতুৎমিসের এই নীতির ফলে ভারত বহু বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

■ <u>খলিফার অনুমোদন</u> :- তিনি 1229 খ্রী: বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে অভিষেক সংক্রান্ত সুলতান উপাধির স্বীকৃতি অনুমোদন পত্র লাভ করেন এবং সুলতান-ই-আজম উপাধিতে ভূষিত হন। এর ফলে দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের এক বৈধতা স্বীকৃত হয়। ইতিপূর্বে কুতুবউদ্দিন আইবক সুলতানি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেও তাঁর রাজত্বের আইনগত স্বীকৃতি ছিল না। এই সময় থেকেই দিল্লীর সার্বভৌম মুদ্রা ও রূপার টঙ্কার প্রচলন হয়, 1236 খ্রী: ইলতুৎমিসের মৃত্যু হয়,

তার প্রকৃত কৃতিত্ব বিচারে বলা যায় যে, মহম্মদ ঘোরি ও কুতুবউদ্দিনের বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি ও স্থায়িত্ব এনেছেন ইলতুৎমিস, ঐতিহাসিক ড. এ. নিজামী মনে করেন যে, ইলতুৎমিসই প্রথম রাজধানী ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন, ঐতিহাসিক আর.পি. ত্রিপাঠী বলেছেন, "The history of Muslim sovereignty in India, begins properly speaking with Iltutmish."
এই জন্য তাঁকেই বলা হয় দিল্লীর প্রথম প্রকৃত সুলতান, এছাড়া তার সামরিক প্রতিভা, দূরদর্শিতা, প্রশাসনিক দক্ষতা প্রভৃতি বিচার করে অনেক ঐতিহাসিক তাঁকে দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান বলে অভিহিত করেছেন,

** সুলতান ইলতুৎমিসের শাসনকাল থেকে সুলতান বলবনের শাসনকাল পর্যন্ত দিল্লী সুলতানদের রাজতান্ত্রিক আদর্শের বিবর্তন আলোচনা করো।

উঃ। দিল্লি সুলতানদের রাজতান্ত্রিক আদর্শ মূলত তুর্কি, ইরানীয় ও মোঙ্গল আদর্শের মিশ্রণে গঠিত হয়েছিল। এই মিশ্র আদর্শে খলিফা ছিলেন বিশ্বের ইসলাম রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রধান অধিকারী। তিনি মুসলিম জগতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও শাসক, আইন ও ন্যায়ের রক্ষাকর্তা, দিল্লীর সুলতানরা খলিফাদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতেন এবং খুতবায় খলিফার নাম উচ্চারণ করতেন। সুলতান বলবনের শাসনকালেই এইরূপ আদর্শ সর্বপ্রথম প্রকাশ পেয়েছিল

রাজতান্ত্রিক আদর্শের বিবর্তন :-

কুতুবউদ্দিন আইবক :- 1206 খ্রী: মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হলে, দিল্লীর আমীর ও সেনাপতিদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে কুতুবউদ্দিন দিল্লি সিংহাসনে স্বাধীনভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় থেকে সুলতানি সাম্রাজ্যের পত্তন হয়, সিংহাসনে কুতুবউদ্দিন আরোহণ করে মহম্মদ ঘোরির অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন এবং নিজ অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য সচেষ্ট হন, তিনি একবার তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে গজনী অভিযান করে সাময়িক সাফল্য লাভও করেন, কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, সুতরাং বলা যায় কুতুবউদ্দিন সম্পূর্ণ ভারতীয় সুলতানে পরিণত হয়,

ইলতুৎমিস :- কুতুবউদ্দিনের মৃত্যুর পর ইলতুৎমিস দিল্লির সিংহাসনে বসেন, তিনি 1229 খ্রী: বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে অভিষেক সংক্রান্ত মুসলিম ফরমানের মাধ্যমে অনুমোদনপত্র লাভ করেন এবং সুলতান-ই-আজম উপাধিতে ভূষিত হন, এই স্বীকৃতি দিল্লির সুলতানি রাজ্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে আইনত মর্যাদা দান করেছিল, খলিফার অনুমোদন লাভ নিলেও ইলতুৎমিস রাজনীতিতে উলেমাদের প্রভাব বিস্তার করতে দেন নি। তিনি তাঁর কন্যাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে দিল্লির সুলতানিতে কাঠমোল্লাতান্ত্রিক কর্তৃত্বে প্রাধান্যের পরিপন্থী হন, তবে এ.কে.এম. নিজামীর বলা যায় যে, মহম্মদ হাবিব ও কুতুবউদ্দিনের বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি ও দৃঢ়তা আনেন ইলতুৎমিস, ঐতিহাসিক নিজামী মনে করেন, ইলতুৎমিসকেই প্রথম সার্বভৌম ও স্বাধীন রাজ্যের প্রকৃত স্রষ্টা দিল্লির সুলতানি-রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গঠন করেন।

বলবন :- বলবন সিংহাসনে বসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া সুলতান ইলতুৎমিসের ক্ষমতা ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছাড়া নাসিরুদ্দিনের রাজত্বের শেষ দিকে অরাজকতা সমাধান করা সম্ভব নয়।

রাজশক্তির প্রতি জনসাধারণের বিশ্বাস ফিরে আসে, অভিজাত সম্প্রদায়ের কোনরূপ অবজ্ঞা ও স্পর্ধা রইল না, রাজশক্তি সম্পর্কে তাদের আর কোনরূপ দ্বিধাও রইল না,

দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রথম রাজতন্ত্রকে একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী রূপ প্রদানে ইসলামের আদর্শে প্রতিফলিত করতে সচেষ্ট হন, তাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল তুর্কি অভিজাত শ্রেণীর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের শক্তির উপর রাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করা, এই উদ্দেশ্যে বলবন পারসিক রাজতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তিনি সুলতানের দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, এছাড়া বলবন সুলতানের ব্যক্তিগত মর্যাদা ও ক্ষমতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন, এক কথায় রাজতন্ত্রকে বলবন এক মহৎ মর্যাদা প্রদান করেছিলেন, সুতরাং বলবন রাজক্ষমতাকে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, প্রজাবর্গ ও অভিজাত শ্রেণীর আনুগত্য লাভ ও রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান করবার নীতি গ্রহণ করেন, তিনি সিজদা ও পাইবস নামে দুটি পারসিক রীতির প্রচলন করেন, রাজসভায় মদ্যপান ও নৃত্যগীত প্রভৃতি বন্ধ করে দেন, সর্বপ্রকার দরবারি আদব কায়দার প্রবর্তন করেন, এই সব পরিবর্তনের ফলে রাজকীয় মর্যাদার ... বলবন কিছুটা হলেও সম্মান ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন,

পরিশেষে আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, দিল্লীর সুলতান কার্যত অধিকাংশই ছিলেন স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাঁদের আদর্শের প্রতিফলন পাওয়া যায় রাজকীয় আড়ম্বর ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে, রাজকীয় আদব-কায়দা ও দরবার শাসনের মাধ্যমে, তবে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে দিল্লীর সুলতানির রাজতান্ত্রিক আদর্শ অনেকাংশেই বিচ্যুত হয়েছিল,

* দিল্লির সুলতানদের মোঙ্গল নীতি পর্যালোচনা কর।

⇒ সুলতানি যুগে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সুলতানি রাজ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিবিধের সমস্যার সম্মুখীন হয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সমস্যা ছিল মোঙ্গল আক্রমণ, এই আক্রমণের ফলে কেবলমাত্র যে উত্তর পশ্চিম ভারত, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল বিধ্বস্ত হতো তাই নয়, সুলতানদের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নীতি অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল, সেই জন্য মোঙ্গলদের আক্রমণের গুরুত্ব ছিল অসাধারণ।

মোঙ্গল কথাটির উৎপত্তি হয়েছে 'মোঙ্' শব্দ থেকে এর অর্থ হলো নির্ভীক, মোঙ্গলেরা ছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি, ধর্মের দিক থেকে তারা ছিল সর্বপ্রথম পৌত্তলিক, তাদের প্রায় সকলেই ছিল দুরন্ত অশ্বারোহী, নির্ভীক ও দুর্ধর্ষ সৈনিক, চেঙ্গিজ খাঁর বাহিনীর অধিকাংশই ছিল এই মোঙ্গল অশ্বারোহী যাযাবররা, পরবর্তী যুগে দুর্ধর্ষ মোঙ্গলজাতি তাদের অনেকে তুর্কী জাতির সঙ্গে মিশে যায় এবং ইসলামধর্ম গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিক K.A. Nizami মনে করেন, মোঙ্গলদের প্রতি দিল্লীর সুলতানদের অনুসৃত নীতি ছিল তিন ধরনের — নির্লিপ্ততা, তোষণ ও প্রতিরোধ, প্রথম ইলতুৎমিস নির্লিপ্ততার নীতি গ্রহণ করেন, তাঁর মৃত্যুর পর 1265 খ্রী: তোষণ নীতি অনুসৃত হয়, বলবনের সময় থেকে সক্রিয় প্রতিরোধমূলক নীতির সূচনা হয়।

মোঙ্গল আক্রমণের পটভূমি :- ভারতবর্ষে প্রথম মোঙ্গল আক্রমণ দেখা দেয় ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে, চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চেঙ্গিজ খাঁ মোঙ্গলদের রাজপদ লাভ করেন, একটি দুর্ধর্ষ বাহিনী নিয়ে তিনি চীনের একাংশ বিরাট অংশ এবং মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলি একের পর এক জয় করেন, তিনি খারজম আক্রমণ করেন এবং সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি শহর বিধ্বস্ত করেন, অত:পর খারজমের সুলতানকে অনুসরণ করে তিনি আফগানিস্থানে উপস্থিত হন, হিরাট, গজনি অধিকার করে 1221 খ্রী: পেশোয়ারে উপস্থিত হন, সুলতানি সাম্রাজ্যের কেন্দ্র দিল্লি মোঙ্গলদের আক্রমণের সম্মুখীন হলো, কিন্তু ইলতুৎমিস খারজমের সুলতান জালালউদ্দিনের আশ্রয় প্রার্থনা অগ্রাহ্য করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করলে জালালউদ্দিন ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হন, সুলতানি সাম্রাজ্য চেঙ্গিজ খাঁর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

Scanned with CamScanner

রাজিয়ার পরবর্তীকালে মোঙ্গল আক্রমণ :- চেঙ্গিস খাঁ ভারত ত্যাগ করে গেলেও তাঁর পরবর্তী মোঙ্গল আক্রমণকারীদের পথ নির্দেশ করে গেলেন। রাজিয়ার পরবর্তী সুলতান মুইজ-উদ্দিন বহরামের রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা হুলাগুর অনুচর বাহাদুর তৈর 1241 খ্রী. এক মোঙ্গল বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাব বিধ্বস্ত করেন এবং লাহোর দখল করেন। অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার জন্য সুলতান তাঁকে দমন করতে অক্ষম হন, অতঃপর 1245 খ্রী: মাসুদ শাহের রাজত্বকালে মোঙ্গলবাহিনী ভারত অভ্যন্তরে ঢুকে মুলতান দখল করলেও এবং উচ্ অবরোধ করলেও, অবশ্য শেষে তারা বলবনের নেতৃত্বে পরিচালিত সুলতান বাহিনীর আক্রমণে পশ্চাদপসরণ করে।

সুলতান নাসিরউদ্দিনের সময়ে মোঙ্গল আক্রমণ :- সুলতান নাসিরউদ্দিনের সময়ে মোঙ্গল আক্রমণ ভারতে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী বলবনের দূরদর্শিতার জন্য সে সমস্ত আক্রমণ প্রায়ই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, পশ্চিম পাঞ্জাবের শক্তিশালী শাসনকর্তা শের খাঁর বাহিনীর কাছে মোঙ্গলবাহিনী কয়েকবার পরাস্ত হলে মোঙ্গল নেতা হুলাগু নাসিরউদ্দিনের কাছে দূত প্রেরণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা দিল্লি সাম্রাজ্যের সীমা আর লঙ্ঘন করবেন না, অবশ্য পাঞ্জাব ও সিন্ধু উপত্যকা মোঙ্গল প্রভাব থেকে কখনও সম্পূর্ণ মুক্ত করা সম্ভব হয়নি।

বলবনের সময়কালে মোঙ্গল আক্রমণ :- বলবনের রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো মোঙ্গল আক্রমণ, অন্যতম দুর্গের সাথে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য তিনি বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, শের খাঁর মৃত্যুর পর তিনি মুলতান, দীপালপুর অঞ্চলে প্রথম পুত্র মহম্মদকে। মোঙ্গলরা পাঞ্জাব আক্রমণ করলে দুই পুত্রের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু 1286 খ্রী: তৈমুর খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা আবার আক্রমণ করলে মহম্মদ তাদের বাধা প্রদান করতে গিয়ে প্রাণ হারান। এর পর বৃদ্ধ সুলতান নিজেই মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভিযান করে পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করেন।

মোঙ্গল আক্রমণ ও জালালউদ্দিন খলজি :- জালালউদ্দিন খলজির আমলে মোঙ্গলরা 1292 খ্রী:, কিন্তু তারা সহজে হেরে গিয়ে সুলতানের সাথে সন্ধি স্থাপন করে।

Scanned with CamScanner

চেঙ্গিস খাঁর নাতি উলুঘ এক হাজার তার অনুচরদের
সঙ্গে একত্রে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং দিল্লীতে স্থায়ীভাবে
বসবাস করতে থাকেন, এরা নওমুসলমান নামে পরিচিত।
সুলতান জালালুদ্দিন খলজি মোঙ্গলদের সঙ্গে সন্ধি করায় হিন্দু
মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্তর বিভিন্ন সময়ে ঘটেছিল। এই
কারণে শিক্ষার প্রভাবে অনেকে অনেকে স্বেচ্ছায়
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি।

... সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য না থাকায় এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, বলবনের অধিকার তখন কার্যত সর্বব্যাপী। কথিত আছে যে বলবন সুলতানকে গোপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন এবং নিজে সিংহাসন দখল করে নেন।

সুলতান বলবন (১২৬৬-১২৮৭ খ্রিস্টাব্দ)

ভারতে এককেন্দ্রিক তুর্কী শাসনের সূচনা ঘটে বলবনের সিংহাসন প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। ত্রয়োদশ শতকে আমরা ভারতের রাজনীতিতে নানা স্বার্থগোষ্ঠীকে কাজ করতে দেখি যাদের কোনোটি রক্তের দ্বারা, কোনোটি গোষ্ঠীর দ্বারা বা কোনোটি শুধুমাত্র প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের দ্বারা গঠিত ছিল। বলবন নিজে ছিলেন এমনই এক গোষ্ঠীর সদস্য। তাঁর উত্থানের পিছনেও গোষ্ঠী রাজনীতি ছিল। সিংহাসনে বসে তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য হল এই সব স্বার্থগোষ্ঠীকে ভেঙে দেওয়া। সুলতানের পদ ও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার জন্য যে এটি ছিল একমাত্র শর্ত—সে কথা বলবন ভালই বুঝেছিলেন। একই সঙ্গে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার তাগিদেও যে সুলতানের শক্তি নিরঙ্কুশ করা প্রয়োজন—এ সত্যও তিনি বুঝেছিলেন। সুলতানের মহিমা ও শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি পারসিক রাজতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করেন। ঐ তত্ত্ব অনুসারে সম্রাট ছিলেন দৈবশক্তি সম্পন্ন এবং তাঁর কাজের জন্য সম্রাট একমাত্র ঈশ্বরের কাছেই দায়বদ্ধ। অর্থাৎ অভিজাতরা রাজকার্যে যেভাবে হস্তক্ষেপ করত—বলবন তাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে এটাও ঘোষণা করেন যে অভিজাতদের অস্তিত্ব নির্ভর করে সম্রাটের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার ওপর।

রাজতন্ত্র সম্পর্কে বলবনের এই চিন্তাধারার সঙ্গে ইসলামের আদর্শের কোনো সাযুয্য পাওয়া যায় না। ইসলামের শাসন অবশ্যই কিছু রীতি-নিয়ম মেনে চালনা করতে হত যেখানে ধর্মীয় ব্যক্তিদের (এক্ষেত্রে উলেমা) বিশেষ ভূমিকা ছিল। বলবন সেই ভূমিকা অস্বীকার করেছিলেন। রাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর ভাবনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের রাজন্যবর্গের ভাবনার কিছুটা মিল পাওয়া যায়। ফলতঃ ইসলামের বিধি ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন যে নতুন রাজতন্ত্র বলবন আমদানি করলেন তা স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগুরু তুর্কী অভিজাতদের পছন্দের ছিল না। অভিজাতদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব

Scanned with CamScanner

রদ করার জন্যই যে এই ব্যবস্থা, গৃহীত হয়েছিল—সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত। বলবন প্রকাশ্য দরবারে *সিজ্‌দা* (আভূমি প্রণাম) এবং *পাইবস* (সুলতানের বা সিংহাসনের পদচুম্বন) প্রথা চালু করেন যা প্রাচীন পারসিক পদ্ধতির অনুরূপ। এই দুটি প্রথাই কিন্তু ছিল ইসলাম-বিরোধী। বলবন নিজে ছিলেন ক্রীতদাস ও বংশ পরিচয় তাঁর বিশেষ ছিল না। তাই পূর্ব পরিচয় ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজেকে পারস্যের প্রাচীন মর্যাদা সম্পন্ন আফ্রাসেয়ব বংশজাত বলে প্রচারও করেন। সাধারণ প্রজা তো বটেই, অভিজাতদের থেকেও যে সম্রাটের আসন অনেক উচ্চে তা প্রমাণের জন্য বলবন এক জাঁকজমকপূর্ণ দরবার পরিচালনা করতেন। দরবারে বলবন কখনো হাসি-তামাশা পছন্দ করতেন না বা কোনো ব্যক্তিকে তা করতেও দিতেন না। দরবারে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ বাক্যালাপও করতেন না। যাবতীয় কথা *মীর হাজিব*-এর মাধ্যমে তিনি শুনতেন এবং বলতেন। জিয়াউদ্দিন বরানী লিখেছেন যে, দরবারের জৌলুস ও তার শৃঙ্খলার কথা এতই প্রচারিত হয় যে দূর দূর প্রান্ত থেকে মানুষ আসত তা দেখার জন্য। দরবারের এই জাঁকজমকের এক সহজ ব্যাখ্যা বরানী দিয়েছেন। বলবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁর প্রতি অনুগত রাখা। অর্থাৎ ঐ সব ব্যবস্থার পশ্চাতে রাজনীতি লুকিয়ে ছিল। তিনি অভিজাতদের পুরোপুরি কেন্দ্র-নির্ভর করে তুলতে চেয়েছিলেন।

এই লক্ষ্যেই বলবন যাবতীয় শাসন ক্ষমতা স্বহস্তে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কোনো ব্যক্তিকে কোনোরকম ক্ষমতা বণ্টনে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হলেই তিনি চরম ব্যবস্থা নিতেন এবং সেই ব্যবস্থা বিষপ্রয়োগ থেকে শুরু করে গুপ্ত ঘাতক নিয়োগ—সবই হতে পারত। কিন্তু অভিজাতদের সাহায্য ব্যতীত শাসন চলবে না—এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাই প্রয়োজন বুঝে তুর্কী অভিজাতদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছেন। বংশকৌলিন্য রক্ষা করা ও তাকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য বলবনের আগ্রহ ছিল। তাঁর রাজত্বে কোনো ভুঁইফোড় বা নীচ বংশজাত কোনো রকম পদ লাভ করেনি। এমনকি *ইক্তা*-ও লাভ করেনি। এভাবে তাঁর রাজত্বে এমন ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তুর্কী অভিজাতরাই সাধারণ হিন্দু ও মুসলমানকে শাসন করবে। এর ফলে হিন্দু এবং ভারতে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের যাবতীয় সরকারি সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে বিদেশীদের এবং বিশেষত তুর্কীদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান আকার নেয়। অবশ্য এ বিষয়ে একমাত্র বলবনকে দায়ী করলে চলবে না। বরানীর বিবরণী অনুসারে বলবনের পূর্ববর্তী সুলতানরাও ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তবে বলবনের নীতি ছিল ঘোষিত যা অন্যদের ছিল না। কিন্তু ড. সতীশচন্দ্র এই ভাষ্য স্বীকার করেন না। তাঁর মতে, মীর আইকতের মত একজন হাব্‌সী, রাইহানের মত একজন ভারতীয় ধর্মান্তরিত ও

Scanned with CamScanner

নিজামুল মুল্‌ক জুনেইদী-র মত সামান্য এক তন্তুবায়ের পুত্র উচ্চ রাজপদ লাভ করেছিলেন এবং এঁরা বেশ কিছুকাল ধরে তুর্কী অভিজাতদের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ ছিলেন। অতএব বলবন যে একমাত্র তুর্কী অভিজাতদের স্বার্থই দেখেছিলেন—এ তথ্য বরানীর স্বকল্পিত। সুলতানী শাসনের জন্য বলবন যে কয়টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তাদের অন্যতম ছিল এক নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা। ন্যায়পরায়ণ হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। নিজের আত্মীয়-পরিজন বা ঘনিষ্ঠ কোনো ব্যক্তিকেই তিনি পক্ষপাত করেননি। সারা সাম্রাজ্যে অসংখ্য *বারিদ* (গুপ্তচর) নিয়োগ করে বলবন সর্বদা সংবাদ সংগ্রহ করতেন। যে-কোনো রকমের অন্যায় ও অত্যাচার তিনি তৎক্ষণাৎ রোধ করার ব্যবস্থা নিতেন। বদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক বকবকের কাহিনী ড. সতীশচন্দ্র লিখেছেন। মালিক মদ্যপ অবস্থায় নিজের এক দাসকে চাবুক মেরে হত্যা করলে মৃতের বিধবা সুলতানের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। বলবন অভিযোগের সত্যতা বিচার করে মালিককে একইভাবে হত্যার নির্দেশ দেন। যে *বারিদ* বদায়ুনে নিযুক্ত ছিল সে এই ঘটনার সংবাদ চেপে যাওয়ায় সুলতান তাকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেন। ঠিক এমন ধরনের অপরাধ করেছিল সুলতানের এক ঘনিষ্ঠ অভিজাত তথা একসময়ে অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হৈবৎ। সুলতান প্রকাশ্যে তাকে ৫০০ বার চাবুক মারার পর মৃতপ্রায় হৈবৎ-কে পাঠিয়েছিলেন হৈবৎ-এর দ্বারা নিহত ব্যক্তির বিধবার কাছে পরবর্তী শাস্তি নির্দেশ করার জন্য। হৈবৎ সেই বিধবাকে ২০ হাজার *টঙ্কা* ক্ষতিপূরণ দিয়ে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এই জাতীয় উদাহরণ আরও আছে।

অভিজাতদের বলবন বাঁচিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন—এ কথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু সুলতানের সমান্তরাল কোনো ক্ষমতার কেন্দ্র তিনি বরদাস্ত করেন নি। তাই অভিজাতদের মধ্যে বিন্দুমাত্র অবাধ্যতা তিনি কঠোর হাতে দমন করতেন। সাধারণভাবে প্রজাদের প্রতিও তাঁর একই মনোভাব ছিল। বলবন বিশ্বাস করতেন যে, অত্যন্ত দারিদ্র্য এবং প্রভূত ধন-সম্পদ দুটির যে-কোনো একটির কারণে বিদ্রোহ ঘটে। পুত্র বুঘরা খানকে বাংলায় নিযুক্ত করার সময়ে তিনি এমন উপদেশ দিয়েছিলেন যে, ভূমি রাজস্ব যেন প্রজাদের কাছে অসহনীয় না হয়। সুলতান হওয়ার পূর্বে নিজের *ইক্তা* শাসনকালে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে তিনি কৃষকদের নানারূপ সাহায্য করে এক অনন্য নজির রেখেছিলেন। এর ফলে *ইক্তা*-য় যেমন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনি তার আদায় বেড়েছিল। সুলতান হিসাবে তিনি সেনাদলকে এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধকালে কোনোভাবেই যেন দরিদ্র, মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষতি না করা হয়।

অবশ্য এসব তখনই ঘটা সম্ভব ছিল যখন প্রজারা অনুগত থাকত। কোনোরূপ অসন্তোষ বা ক্ষোভের ইঙ্গিত পেলেই বলবন নির্দয় আচরণ করতেন। দিল্লির উপকণ্ঠে

মেওয়াটী উপজাতিকে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে তাঁর ঐ মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছিল। ইলতুৎমিসের মৃত্যুর পর থেকে মেওয়াটীরা রাজধানী ও তার সংযোগকারী পথে নিয়মিত দস্যুবৃত্তি করত। কৃষি, বাণিজ্য এবং নিত্যকার জীবনযাত্রা সবই দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। দিল্লি কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সিংহাসনে বসে বলবনের প্রথম কাজ ছিল মেওয়াটী দস্যুদের দমন করা। তিনি দিল্লির পার্শ্ববর্তী যাবতীয় জঙ্গল সাফ করায় দস্যুদের গোপন আস্তানাগুলি ভেঙে যায়। তিনি নির্বিচারে মেওয়াটীদের হত্যার নির্দেশ দেন। ঐ অঞ্চলে বলবন একটি দুর্গ তৈরি করে নিয়মিত সেনা টহলের ব্যবস্থা চালু করেন। বহু থানা স্থাপন করে আফগান যোদ্ধাদের সেইসব থানার দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং নিষ্কর গ্রাম বণ্টন করে বলবন আফগানদের বসতি স্থাপনে উৎসাহ দেন। এভাবেই মেওয়াটী সমস্যার এক স্থায়ী সমাধান ঘটানো হয়।

সাম্রাজ্য বিস্তার অপেক্ষা বলবন শান্তি রক্ষার দিকেই অধিক যত্নশীল ছিলেন। দিল্লির সমস্যা যেমন মেওয়াটী দস্যুর তেমনি বদায়ুন ও আমরোহার সমস্যা ছিল রোহিলখণ্ড অঞ্চলের দস্যুরা। তারা নিরন্তর গ্রামবাসীদের পীড়ন করত। বলবন এক্ষেত্রেও সেনা পাঠিয়ে নির্বিচারে দস্যুদের হত্যা করে শান্তি ফিরিয়ে আনেন।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার করার জন্য জরুরী ছিল এক দক্ষ সেনাদল। বলবন এক্ষেত্রেও যথেষ্ট সফল। সেযুগে নিয়মিত সরকারি সেনাদের আয়তন খুব বড় ছিল না। তথাপি বলবন প্রত্যক্ষভাবে সুলতানের নিয়ন্ত্রিত সেনাদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোযোগী ছিলেন। তিনি দক্ষ ও সাহসী *সওয়ার* (অশ্বারোহী) নিযুক্ত করে তাদের পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞ *মালিক* এবং *সর্দার* মনোনীত করেন। এইসব *মালিক* ও সেনারা *দোয়াবের* সমৃদ্ধ এলাকায় বেতন বাবদ *ইক্তা* ও *ওয়াঝ* লাভ করত। এইভাবে নতুন *ইক্তা* বিলির সময়ে তিনি পূর্বতন *ইক্তাদার*-দের এক তালিকা তৈরি করান। ইলতুৎমিসের সময় থেকেই *ইক্তা* বণ্টিত হয়ে আসছিল। সেই সময়ের *ইক্তাদার*-দের *শাম্‌সী ইক্তাদার* রূপে চিহ্নিত করা হত ও তারা বিশেষ সুবিধা ভোগ করত। বলবন পরীক্ষা করে দেখেন যে তাঁর রাজত্বে *দোয়াবে শাম্‌সী*-দের সংখ্যা প্রায় ২০০০। এদের নাম সরকারি নথিতে ছিল কিন্তু বাস্তবে এদের অনেকেই ছিল মৃত। *দেওয়ান-ই-আর্জ* (সামরিক বিভাগ)-এর দপ্তরে এই বিষয়ে ঢালাও দুর্নীতি চলত। বলবন এই ধরনের যাবতীয় *ইক্তা* বাজেয়াপ্ত করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু দিল্লির কোতোয়াল, ফকিরুদ্দিনের পরামর্শে এই কাজ হতে বিরত থাকেন। তবে *ইক্তা*-র সমস্যা যে বলবন কিয়দংশে মীমাংসা করেছিলেন—এ বিষয়ে ঐতিহাসিকরা একমত।

ইক্তা বণ্টনের সময়ে *দোয়াবের* প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হত। ইলতুৎমিসের রাজত্বকাল থেকেই এই ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। *দোয়াব* ছিল উর্বরা এবং এই অঞ্চল থেকে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণও ছিল ভাল। বলবন উচ্চ পদাধিকারী *আমীর*-দের

Scanned with CamScanner

সাধারণভাবে *দোয়াবে ইক্তা* বণ্টন করতেন। সেখানে রাজস্ব আদায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু যে সব গ্রাম বলবনের নির্দেশ মানতে অসম্মত হত সেগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ ধ্বংস করতেন। পুরুষদের হত্যা করে নারী ও শিশুদের দাস ও দাসী হিসাবে নির্বিচারে বিক্রি করে দেওয়া হত। নতুন নতুন দুর্গ নির্মাণ করে ঐ অঞ্চলে তিনি সুলতানের কর্তৃত্ব আরও দৃঢ় করেন এবং অনুগত আফগানদের নতুন বসতি গড়তে উৎসাহ দেন। এভাবে *দোয়াবের* জন-বিন্যাসে তিনি পরিবর্তন ঘটান। তবে সন্দেহভাজন অভিজাতদের দূরতম অংশে ও সীমান্তে *ইক্তা* বণ্টন করা হত। সেখানে নিজেদের প্রতিরক্ষার চিন্তাতেই *ইক্তাদার*-রা নিয়মিত ব্যস্ত থাকত এবং রাজধানীর রাজনীতি নিয়ে কদাপি মাথা ঘামাতে পারত না।

বলবন কেন্দ্রীয় সেনাদলের সংস্কারে ব্রতী হলেও অধিকাংশ সেনা যোগান দিত অভিজাতরা। তাদের সেনাদল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে অভিজাতরা যে নিজ গোষ্ঠীভুক্তদের নিয়ে সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেনাবাহিনীতে অশ্ব ও হাতির বিশেষ কদর ছিল। একটি হাতিকে ৫০০ *সওয়ার*-এর সমতুল বলে গণ্য করা হত। ভারতে হাতি ছিল সহজলভ্য। কিন্তু অশ্ব সহজে পাওয়া যেত না। অশ্ব আরব ও মধ্য এশিয়া থেকে স্থলপথে আমদানি করা হত। মোঙ্গলদের উৎপাতের ফলে ঐ পথে অশ্ব আমদানির পরিমাণ ছিল তখন নগণ্য। বাধ্য হয়ে বলবন ভারতীয় অশ্ব সংগ্রহে মনোযোগী হন। কিন্তু সেনা দলে বিদেশী মুসলমানদেরই তিনি অধিক প্রাধান্য দিতেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামী ছিল না বলে অনেকে মত দিয়েছেন। কারণ, বাংলায় বিদ্রোহ দমন কালে তিনি রাজধানী থেকে যখন সেই প্রদেশে অভিযান করেন তখন, অযোধ্যায় প্রায় দুই লক্ষ নানা শ্রেণীর মানুষকে বলবন সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এদের অধিকাংশই ছিল ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু।

সবদিক বিচার করলে দেখা যায় যে, বলবনের রাজত্বলাভের মাধ্যমে সুলতানী শাসনে নানাবিধ পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু বলবন তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা নিরঙ্কুশ করার জন্য বিরোধী অভিজাতদের ষড়যন্ত্র ও গুপ্তহত্যার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কোনো রাজনৈতিক মতবাদ তিনি উপহার দিতে পারেন নি।

Scanned with CamScanner

সুলতান হিসাবে এটাই ছিল ...

অভিজাতদের বিদ্রোহ

রাজপুত রাজ্যগুলি যখন নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য যুদ্ধরত এবং সীমান্ত মোঙ্গল আক্রমণের ফলে উত্তপ্ত তখন বলবনের সামনে এক জ্বলন্ত সমস্যা স্বরূপ উপস্থিত ছিল তুর্কী অভিজাতদের বিদ্রোহ। মোঙ্গলদের আক্রমণে রাজ্যহারা হয়ে গজনীর কুরলুগ শাসকরা মোঙ্গলদের মতই সিন্ধু নদী অতিক্রম করে লবণ পাহাড় পর্যন্ত এলাকায় এসে আস্তানা স্থাপন করে। ফলতঃ সীমান্তবর্তী অঞ্চল পাঞ্জাবের ওপরও দিল্লির কর্তৃত্ব তখন অটুট ছিল না। বলবন নানাবিধ সমস্যায় জড়িত থাকায় সিন্ধুর স্থানীয় প্রধানরা মোঙ্গলদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীনতা ঘোষণা করতে থাকে। এই পরিস্থিতি অবশ্য নতুন ছিল না। সীমান্তের সমস্যা ইলতুৎমিসের রাজত্বে একই রকম ছিল। বলবন নতুন সেনাদল পাঠিয়ে এবং দুর্গগুলির সংস্কার করে সিন্ধু ও মুলতানের ওপর দিল্লির কর্তৃত্ব অবশ্য অনেকাংশে ফিরিয়ে আনেন।

বলবনের অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল বাংলা ও বিহার। লক্ষ্মণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে যে শাসক ঐ অঞ্চলে শাসন করত তার ওপর দিল্লির আক্ষরিক নিয়ন্ত্রণ সব সময়ে থাকত না। ভৌগোলিক দূরত্বই তার প্রধান কারণ বলা চলে। বাংলার খলজী শাসকরা স্বাধীন হয়ে উঠলে ইলতুৎমিস দুইবার বাংলায় অভিযান

Scanned with CamScanner

করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর লক্ষ্মণাবতী পুনরায় স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করে। সেখানে তুর্কী শাসক তুঘন খান বিহার পর্যন্ত নিজের আধিপত্য মজবুত করেন। তিনি অযোধ্যা দখলেরও চেষ্টা করেছিলেন। তবে তুঘন ছিলেন অত্যন্ত সাবধানী। তিনি প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি এবং রাজিয়া ও তাঁর উত্তরাধিকারীর নিকট থেকে নিজের শাসন সংক্রান্ত অনুমোদনপত্র আদায় করেন। কিন্তু প্রতিবেশী ওড়িয়া অভিযান করতে গিয়ে তিনি বিপদে পড়েন এবং নিজে বাঁচার তাগিদে দিল্লির সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সময়ে অযোধ্যা থেকে সেনারা আসায় ওড়িযার সেনারা বাংলার সীমানা ত্যাগ করে। এই ঘটনার পর অযোধ্যার শাসক তুঘনকে গদীচ্যুত করে নিজেই লক্ষ্মণাবতী দখল করে নেন। কিন্তু আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হলেন। সুলতান নাসিরুদ্দিন মামুদের *নায়েব* হিসাবে কর্মরত বলবন লক্ষ্মণাবতীর ঘটনাবলীর প্রতি নজর রাখতেন এবং শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য নিজের বিশ্বস্ত ক্রীতদাস উজবেককে সেখানে পাঠান। কিন্তু উজবেক লক্ষ্মণাবতী পৌঁছে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অযোধ্যা পর্যন্ত এলাকা জয় করেন। অবশ্য এই সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। দিল্লির সেনারা অযোধ্যা পুনরুদ্ধার করে। অপর দিকে কামরূপ অভিযান করতে গিয়ে উজবেক ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধে বন্দী হয়ে নিহত হন।

উজবেক নিহত হলেও বাংলার ওপর যে দিল্লির কর্তৃত্ব ধরে রাখা এক কঠিন কাজ, তা তখন পরিষ্কার। উজবেকের মৃত্যুর পর বলবন অপর এক ক্রীতদাস, তুঘ্রিল খানকে বাংলায় পাঠান। কিন্তু এক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিই ঘটল। তুঘ্রিল স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য জাজনগর জয় করে বিপুল সম্পদ লুঠ করেন।

বলবন পর্যায়ক্রমে নিজের ক্রীতদাসদের এই বিদ্রোহ দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তিনি ১২৭৬ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যার শাসক আমীন খানকে তুঘ্রিলের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। কিন্তু তুঘ্রিল উৎকোচ দিয়ে অযোধ্যার সেনাদের ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হলে আমীন অভিযান ত্যাগ করে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ব্যর্থতার ফলস্বরূপ আমীনকে প্রকাশ্যে প্রাণ দিতে হল। এরপর বলবন সেনাপতি বাহাদুরকে তুঘ্রিলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বীরের মত যুদ্ধ করেও বাহাদুর ব্যর্থ হলেন। পরপর দুটি অভিযানের করুণ পরিণতিতে ক্ষিপ্ত বলবন স্বয়ং লক্ষ্মণাবতী অভিযান করেন। কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনিও সন্দিহান ছিলেন। তাই অভিযান শুরুর পূর্বে প্রকাশ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করে যান। দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খান সহ বিশাল বাহিনী তাঁর অনুগমন করলেন।

তুঘ্রিলের সঙ্গে বলবনের যুদ্ধ দুই বছর (১২৮০-৮২ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত চলেছিল। নানা উত্থান-পতনের পর বলবন তুঘ্রিলকে বন্দী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বন্দী

Scanned with CamScanner

অবস্থাতেই তুঘ্রিলকে হত্যা করা হল। লক্ষ্মণাবতীর প্রধান রাজপথের দুই ধারে তুঘ্রিল খান ও তাঁর আত্মীয় পরিজন তথা অনুগামীদের নৃশংসভাবে হত্যা করে প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখা হয়েছিল। বিদ্রোহীদের শাস্তির চেহারা দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তী বহুদিন মানুষের মনে তা গাঁথা ছিল। বলবন যে কোনো মতেই ঔদ্ধত্য ও বিদ্রোহ মেনে নিতে নারাজ তা লক্ষ্মণাবতীর ঘটনা প্রমাণ করল। বলবন এবার পুত্র বুঘরা খানকে লক্ষ্মণাবতীর শাসক নিযুক্ত করেন বারংবার বিদ্রোহের প্রবণতা রোধের উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খানও স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

উপরিউক্ত অংশগুলি ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা মূলক ব্যাবস্থার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি থেকে নেওয়া।নিম্নে সকল লেখক লেখিকাদের প্রতি আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

১)ভারতের ইতিহাস ৬৫০-১৫৫৬

লেখক - তেসলিম চৌধুরী

২)সরল ভারতের ইতিহাস ১২০৬-১৭০৭

লেখক - অধ্যাপক চক্রবর্তী ও চক্রবর্তী।

৩)আদিমধ্য ও মধ্যযুগের ভারত

লেখক -সুবোধ কুমার মুখ্যপাধ্যায়।

৪)ভারতের ইতিহাস

লেখক - জীবন মুখোপাধ্যায়।

বিনীত

পিয়াঙ্কি সোম

Scanned with CamScanner